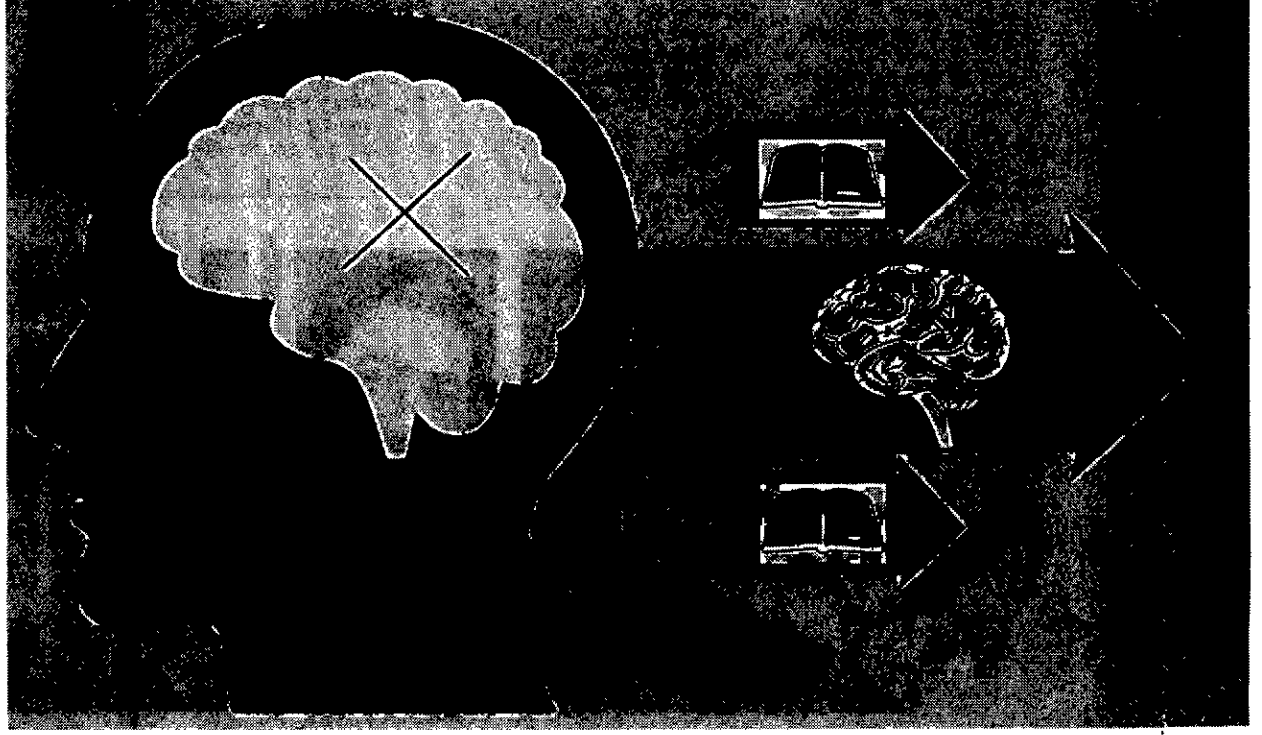
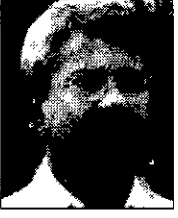


এ কে এম শাহনাওয়াজ ▽

পাঠ্যবহির্ভূত বই পড়ার সময় কোথায়!



দেড়-দুই যুগ আগের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রী অনেকেই আমার কাছে আসত ক্লাস সংশ্লিষ্ট পাঠ্যবহির্ভূত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে দেশ-বিদেশের সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, শিল্পকলা নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে আমিও ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছি-শিখেছি। আজ তেমন কৌতূহল নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আসতে দেখি না। কেউ এলেও আলোচনা বেশি দূর এগোয় না। ওদের জানা ও কৌতূহলের জগৎ খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে

একটি নামি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম। ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত। তাদের মধ্যে দুজন ছাত্রী পেলাম, যারা একুশের বইমেলা বলে যে কিছু আছে তা কখনো শোনেনি। সাতজন ছাত্রছাত্রী কথাটা শুনেছে বটে, তবে মেলাটি কোথায় হয় জানে না। একজন বাণিজ্য মেলার সঙ্গে বইমেলা গুলিয়ে ফেলল। ৯ জন বইমেলা কোথায় হয় জানে, কিন্তু কখনো যায়নি। বাকি ১৭ জন বইমেলায় এক-দুবার গেছে। তাদের ছয়জন কখনো বই কেনেনি। বাকিরা একটু-দুটি করে বই কিনেছে। বইমেলা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই সেই দুজন ছাত্রীর একজন স্বীকার করল, বাড়িতে কখনো বইমেলা সম্পর্কে আলোচনা শোনেনি। ফেব্রুয়ারি মাস এলে পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে বইমেলা নিয়ে নানা কিছু লেখা হয়, দেখানো হয়। কিন্তু এ জগতের সঙ্গে ও তাদের পরিচয় কম। সংবাদপত্র পড়া হয় না! অনেকেই। আর টেলিভিশন দেখার চেয়ে মোবাইল ফোনের দামি পর্দায় নানা আনন্দ খুঁজে নেওয়ায় তারা অভ্যস্ত বেশি। বইমেলায় কখনো যায়নি—এমন এক ছাত্রী সোজাসাতি বলে ফেলল, এসব ‘একটু’ বই পড়ার সময় কোথায় তাদের!

শেষ মন্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে আমার কাছে। মানসিক অনেকেরই বই পড়ার মতো পারিবারিক প্রপোদনা নেই, পরিবেশও নেই। তবে তাদের ভাষায় ‘একটু’ বই পড়ার সময় সত্যিই খুব কম। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম একটু ভিন্ন। এমনিতেই সেমিস্টার সিস্টেমে খুব তড়িঘড়ি করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিন মাসে (কখনো ছয় মাসের সেমিস্টার) কোর্স পাঠদান আর পরীক্ষা শেষ করতে হয়। আধুনিক বিশ্বের নানা দেশ থেকে সেমিস্টার পদ্ধতি আমদানি হয়েছে। এখন বেসরকারি ও অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছে এই পদ্ধতি। সব পদ্ধতির ভাঙো-মন্দ আছে। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, সেমিস্টার পদ্ধতিতে বিবিধক সময়ের মধ্যে পাঠদান ও পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব। এতে সেশন জট বেড়ে যাওয়ার সুযোগ কম থাকে। তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট নিয়ে কর্মজীবনে বাপিয়ে পড়তে পারে শিক্ষার্থী। কিন্তু তিন মাসে ক্লাস পরীক্ষা, টিউটোরিয়াল, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদি করতে করতে আর কিছু ভাবার সময় থাকে না শিক্ষার্থীদের। নির্ধারিত নোট-হ্যান্ডআউট ছাড়া লাইব্রেরি চর্চার বিশেষ সময় পায় না তারা। বাকি যে সময় থাকে তখন ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে নান্দনিকতা চর্চা বা জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করার মতো তথাকথিত ‘একটু’ বই পড়ার সময় বের করা শিক্ষার্থীদের জন্য সত্যিই কঠিন। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আমাদের দেশের মতো সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না। মৌলিক শিক্ষার পর ডিপ্লোমা ধরনের নানা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পর কর্মক্ষেত্রে চলে

যায়। আর গবেষণার ক্ষেত্রে যারা থাকতে চায় তারা বিশেষায়িত বিদ্যায় নিজেদের যুক্ত করে। তাই তাদের কারিকুলামই এমন যে সেমিস্টারে ঢুকে অনেক কিছুই পড়ে, তবে কোনো কিছুর গভীরে যাওয়া হয় না। আমাদের বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (অধুনা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগেও) কারিকুলাম ও সিলেবাস এসব আধুনিক দেশের দর্শনেই পরিচালিত হচ্ছে। এসব অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্য দেশে পাড়ি জমায় ও ক্রেডিট ট্রান্সফার করে চলে যায়, তাদের না হয় একটি জীবন তৈরি হয়, কিন্তু দেশে থাকাদের অনেকেই জ্ঞানের রাজ্যে না ঘরকানা-ঘাটকা হয়ে থাকে।

এখানে আমি ফরাসি দেশের একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিতে চাই। গত মে মাসের কথা। আমি প্যারিসের প্রধান রেলস্টেশন গিয়ার দ্য লিয়নের কাছাকাছি এক হোটেলে উঠেছি। এর কাছেই এক মেট্রো রেল স্টেশন থেকে পাতাল রেল ধরে বাস্কিলাম ন্যুভর জাদুঘর দেখতে। ভেতরে দরজার ওপরে স্টেশনগুলোর নাম লেখা আছে। দেখলাম, ন্যুভরের দুই স্টেশন আগে বাস্তিল স্টেশন। নামটি পড়ে আমি শিহরিত হলাম। ১৭৮৯ সালে এই বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটিয়েছিল ফ্রান্সের বিপ্লবীরা। প্যারিসের মানচিত্রে আমার নখদর্পণে ছিল। আমি সেন নদীর সমান্তরালেই পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটছি। ন্যুভর জাদুঘরও সেন নদীর কাছে। তাই ঠিক করলাম ফিরতি পথে নদীকে নিশানা ধরে হেঁটে হেঁটে বাস্তিল আসব। দুর্গটি নিচুই সংরক্ষিত আছে। এ যাত্রায় দুর্গটি দেখতে হবে।

ফিরতি পথে হেঁটে চলে এলাম বাস্তিলে। মুশকিল হলো, বাস্তিল দুর্গের হিন্দস পাব কোথায়! এখানে মানুষ ইংরেজি বোঝে না, বলেও না। পর্যটন মৌসুম চলছে। নদীর তীরে পর্যটকের ছড়াছড়ি। নদীর ওপর একটু দূরে দূরে ব্রিজ দিয়ে দুই পারে সংযোগ তৈরি করা হয়েছে। দুই পারেই শহর। তাহলে বাস্তিল দুর্গ কোন পারে হবে? আমি দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করে ব্যর্থ হলাম। ভাবলাম, ঐতিহাসিক ‘বাস্তিল ফোর্ট’ শব্দটি শুনে হয়তো কেউ সাহায্য করতে পারে। বারবার ব্যর্থ হয়ে এবার বিকল্প চিন্তা করলাম। ব্রিজগুলোর ওপর অর্ধবৃত্তাকার বাড়তি বলুপ্ত অংশ আছে। ওখানে চিত্রশিল্পীরা বসে তাদের চিত্রকর্ম বিক্রি করেন। আবার কেউ নিজেদের ফ্রেচও আঁকাতে পারেন। ভাবলাম, শিল্পীরা নিচুই ইতিহাসের খোঁজ রাখবেন। আমি একজন মাঝবয়সী চিত্রকরকে টার্গেট করলাম। যখন তাঁর কাছে পৌঁছলাম তখন দুজন ফরাসি তরুণ-তরুণী এলো তাদের ফ্রেচ আঁকাতে। মনে মনে খুশি হলাম। এই তিনজন আমাকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু অবাক হলাম যখন মনে হলো বাস্তিল ফোর্ট কথটি

আমি যেন প্রথম তাদের শোনলাম। কপাল ভালো, ওরা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারছিল। চিত্রকর গভীর হওয়ার ভান করলেন আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার বয়সী তরুণ-তরুণীর মুখাবয়বে বিব্রত হওয়ার ভাব প্রকাশ পেল। বিষয়টাকে সহজ করার জন্য আমি ফ্রেঞ্চ রেভলুশন (ফরাসি বিপ্লব) স্মরণ করিয়ে দিলাম। আমি বিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ করলাম, ফ্রান্সের দুই তরুণ-তরুণী ফরাসি বিপ্লবের কথাও যেন প্রথম শুনল। তবে মাথা ঝাকালেন চিত্রকর। ফরাসি বিপ্লবের কথা শুনেছেন বটে, তবে বিস্তারিত জানেন না।

এই অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি এবং জানার চেষ্টা করেছি। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ও গবেষণার সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা ছাড়া সাধারণ শিক্ষিত উন্নত দেশের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ ইতিহাস-ঐতিহ্যের খোঁজ করা যায় এমন গভীরে পৌঁছার মতো কারিকুলামে অবস্থান করে না। তারা উন্নত বিশ্বের প্রজন্ম। স্বাস্থ্যদ্য জীবন চালানোর মতো নানা উপায় তাদের আছে। এসব অপূর্ণতা দেশ-জাতিকে হয়তো কিছিয়ে দিচ্ছে না। কিন্তু অভিন্ন ধারার কারিকুলামে হাঁটতে গিয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেভাবে পড়াচ্ছে তাতে কী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে আমি বুঝতে পারি না। নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী দেশান্তরী হয়ে বা দেশে থেকে ব্যক্তিগীবনের উৎকর্ষ ঘটাতে পারবে ঠিকই, তবে মাঝারি ধারার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের বড় অংশ দেশের বোঝায় পরিণত হবে।

এ ধারার আলোচনায় আমার এক মেধাবী ছাত্র তথাকথিত ‘একটু’ বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করল এভাবে। কিছুদিন আগে এক জনপ্রতিনিধি ফ্রাউন্টের ছেলের তৈরি মানবসেতু পাড়ি দিতে স্যুটেড-বুটেড হয়ে শিক্ষার্থীদের ঘাড় মাড়িয়েছেন। হয়তো ছাত্রছাত্রীরাই তাঁকে অনুরোধ করেছে। তিনি হয়তো অনুরোধ রক্ষা না করে পারেননি। সে ক্ষেত্রে জুতা খুলে একটু ক্ষণের জন্য সেতুতে প্রতীকী পা রাখতে পারতেন। কিন্তু দেখা গেল আনন্দচিত্তে তিনি জুতা পায়ে পুরো ‘সেতু’ মাড়ালেন। আমার ছাত্রটির ভাষা, এই মেয়ের জীবনে হয়তো ‘একটু’ বই পড়েননি। তাই মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো জেগে ওঠেনি। বিবেকের দরজা খুলতে পারেননি। যদি পারতেন তবে ছাত্রের অনুরোধ করলেও তিনি উচিত-অনুচিতের প্রমত্তি নিজের ভেতরে খুঁজে পেতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের শিক্ষার্থীদের। জীবনের সবচেয়ে বর্ণিল সময়টিতে ওরা সেমিস্টারের চাপে আর ক্লাস পরীক্ষার অষ্টোপাস বেষ্টনীতে পরে সুকুমার বৃত্তি জাগিয়ে তুলতে পারছে না। সময়ের তাড়নায় পাঠ্য বইও সংকুচিত হয়ে গেছে। এখন ক্লাস পরীক্ষা ছাড়াও সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যমসহ নানা ইলেকট্রনিক আনন্দে পাঠ্যভাস ও জ্ঞানচর্চাকে সংকুচিত করে ফেলে আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করছি। দেড়-দুই যুগ আগের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রী অনেকেই আসত ক্লাস সংশ্লিষ্ট পাঠ্যবহির্ভূত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে দেশ-বিদেশের সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি, শিল্পকলা নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে আমিও ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছি-শিখেছি। আজ তেমন কৌতূহল নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আসতে দেখি না। কেউ এলেও আলোচনা বেশি দূর এগোয় না। ওদের জানা ও কৌতূহলের জগৎ খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেককে দেখে চিন্তা হয়। নিজ বি-অর্জন করে এবং আরো নানা কারণে শিক্ষক হয়েছেন। কিন্তু ওই ‘একটু’ জগতের খোঁজ করার সুযোগ হয়তো ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক জায়গাটিও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সায়েন্স এ থেকে উত্তরণের উপায় কী! এ এবারের কোনো কিনারা করতে পারি অগুনতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে। সবারই শিক্ষার মাধ্যম কয়েকটি খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যা দায়িত্ব নিয়েই বলব, পাবলিক দি পারা এসব শিক্ষার্থীর বেশির ভাষাজ্ঞান নিয়ে আসে। বি-ইংরেজি লেখার বিষয়টি মানদ দায় হবে। তারাও বলে, ‘ত লিখতে পারতাম তাহলে আম হতো লিখতেও পারতাম হ মাধ্যমে বন্দি করে দিয়ে শিক্ষা শিক্ষা হচ্ছে, না পঠিত বিষয়ে লাইব্রেরিতে যাওয়া তো এই আমি একটি খ্যাতিনামা ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করে দে লাইব্রেরি ছাড়া ঢাকা শহরে কোন লাইব্রেরি আছে তা পারেন না। আর সে প্রয়োজন আমার মনে হয়, নানা সং-শিক্ষাব্যবস্থায় কোথাও বড় রয়েছে দূরদর্শী চিন্তার অভ-মহল যদি এখনই না আ-আলোচনিক ভুবন পাবে

লেখক : অধ্যাপক